স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় শূদ্রমুক্তি: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

উত্তম দোলাই

তপন কুমার দে

সারসংক্ষেপ: বর্তমান ভারতবর্ষ যখন শূদ্রের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, শূদ্রমুক্তির বিষয়টি যখন ভাবনার বাতুলতা ছাড়া কিছু নয় তখন ভারতবাসী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করতে ইচ্ছে করে। আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগে স্বামীজী শূদ্রমুক্তির জন্য যে পথ বলে দিয়ে গেছেন আমরা আজও সেই পথ অনুসরণ করতে পারিনি। আমাদের এই প্রবন্ধে স্বামীজীর এই শূদ্রমুক্তির ভাবনাটিকে দার্শনিক চিন্তার আলোকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি। এক দিকে গীতায় চতুর্বর্ণ সৃষ্টির ব্যাখ্যায় এবং অন্যদিকে মনুসংহিতায় চারটি জাতির সৃষ্টির ব্যাখ্যা আমাদের এই লেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে স্বামীজী কিভাবে এই দুই ভাবনা থেকে সরে এসে বৈদান্তিক সমাজবাদী ভাবনার আলোকে শূদ্রমুক্তির বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন— সেই বিষয়টিও আমাদের এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। শূদ্রমুক্তির সম্ভাবনা স্বামীজীর বৈদান্তিক সমাজবাদের ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং শূদ্রমুক্তি, স্বামীজীর ভাবনায় গীতা এবং মনুসংহিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

বীজশব্দ: শূদ্র, বৈদান্তিক সমাজবাদ, শূদ্র জাগরণ, বিশ্বমানবতাবোধ, পুরোহিত তন্ত্র, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, উচ্চবর্ণের আধিপত্য, সর্বভূতান্তর আত্মা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমাজে পিছিয়ে পড়া শূদ্র মানুষের বন্ধু, তাদের দুঃখে সমব্যথী ও আপনজন। যখন তিনি পরিব্রাজক রূপে সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া শূদ্র মানুষের প্রতি একাত্মতার ভাবটি দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, পরিব্রাজক জীবনে বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে অস্পৃশ্য মেথরের ছোঁয়া তামাক খেয়েছেন আবার রাজস্থানের রেলস্টেশনে তিনদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর জাতপাতের কুসংস্কার অগ্রাহ্য করে চামার জাতির এক লোকের হাতে তৈরি রুটি তিনি খেয়েছেন। বিবেকানন্দের জীবন দর্শনের মূল কথা ছিল উদার মানবতাবোধ। মানব কল্যাণই ছিল তাঁর ভাবনার মূলকেন্দ্র।

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ অভিজাত শ্রেণির বিশেষাধিকার, অন্যায় জাত-বিভাজন ও অস্পৃশ্যতায় ছিলেন তীব্র সমালোচক। বিবেকানন্দই বীরদর্পে নিজেকে একজন 'সমাজতন্ত্রী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে তিনি মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, ধনী অর্থাৎ উঁচু শ্রেণি এবং দরিদ্র অর্থাৎ নীচু শ্রেণি। তিনি বিশ্বাস করতেন, এমন সময় আসবে যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশে শূদ্র জনতার জাগরণ ঘটবে। উঁচু শ্রেণি অধিষ্ঠানচ্যুত হবে এবং নীচু শ্রেণি হিসাবে শূদ্ররা একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করবে অর্থাৎ 'শূদ্র' শ্রেণির জাগরণ তথা শূদ্রমুক্তি ঘটবে, কালের বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে। শূদ্র কাদের বলা হয় — এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে গীতায় স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবত্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে চারটি বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে —

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।"[১]

অর্থাৎ আমার দ্বারাই গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণ সৃষ্ট হয়েছে। এর কর্তা হয়েও বিকার রহিত আমাকে কর্তা বলে জেনো।

সুতরাং গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে শূদ্র আসলে সেই জাতির মানুষকে বোঝানো হয়েছে যারা কেবল তমো গুণের অধিকারী। গীতার এই ব্যাখ্যা অনুসারে শূদ্র নির্দিষ্ট কোন জাতি নয়, আসলে একটি নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী। যদি শূদ্র জাতির মধ্যে বা কোনো ব্যক্তি শূদ্রের মধ্যে সত্ত্ব গুণের আধিক্য ঘটে তাহলে শূদ্রমুক্তি তার পক্ষে সম্ভব। এখানে শূদ্রমুক্তির বিষয়টি নির্ভর করছে ব্যক্তির অন্তরের গুণের ওপর বা কোনো বাইরের শক্তির ওপর নয়।

অন্যদিকে, মনুসংহিতা অনুসারে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মার পদযুগল থেকে। বলা হয়েছে —

"লোকনাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।।"[২]

অর্থাৎ ব্রহ্মা লোকবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পদ থেকে চারটে বর্ণের সৃষ্টি করলেন। মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদ থেকে শূদ্রের সৃষ্টি করেছেন। মনুসংহিতায় শূদ্র সৃষ্টির যে বিষয় উল্লিখিত হয়েছে সেখানে শূদ্রমুক্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে রহিত। পদযুগল থেকে উৎপন্ন বলে শূদ্রের পক্ষে কোনোভাবে নিজেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি শূদ্রের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটলেও তাকে শূদ্রই থাকতে হয়, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য ঘটলেও তাকে ব্রাহ্মণই বলতে হবে। কর্মচ্যুত বা ধর্মচ্যুত হওয়ার বিষয়টি এখানে বিবেচ্য নয়। তাই মনুসংহিতার ভাবনা অনুসারে যে শূদ্রের উৎপত্তি তারা একটি জাতি হিসাবেই পরিগণিত, ব্যক্তি শূদ্রের ভাবনা এখানে অমূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র — এই চারটি শ্রীকৃষ্ণ কথিত বর্ণের পরিচয় হলেও, মনুসংহিতায় এসে তারা জাতির পরিচয় লাভ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্র মুক্তি বিষয়টিকে বৈদান্তিক সাম্য ভাবনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের চরিত্র গঠন বিবেকানন্দের সমাজ চিন্তার মূল ভিত্তি। ব্যক্তি ও সমাজের আলোচনায় তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যক্তিকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী'। তিনি অবশ্যই সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজের কাছে ব্যক্তিত্বের লোপ হোক — তা তিনি চাইতেন না। তাঁর মতে উন্নতির প্রথম শর্তই হল স্বাধীনতা। শূদ্রমুক্তি কী ? সুতরাং এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। স্বামীজী শূদ্রমুক্তির বিষয়টিকে কিভাবে দেখেছেন। শূদ্র আসলে স্বামীজীর কাছে জাতি হলেও ব্যক্তির প্রাধান্য রয়েছে। তিনি মনে করেন, গীতার দৃষ্টি অনুসারে শূদ্র ব্যক্তির অন্তর গুণের পরিবর্তন সাধন করে তার মুক্তি সম্ভব। তাই তিনি যখন মানুষকে দেবতায় উন্নীত হওয়ার আহ্বান জানান তখন আসলে পরোক্ষভাবে তিনি বর্ণবাদের বিলোপ ঘটাতে চান। শূদ্র যদি চেষ্টা করে তাহলে তার পক্ষে শূদ্রত্ব থেকে বৈশ্যত্বে, বৈশ্যত্ব থেকে ক্ষত্রিয়ত্বে, আবার ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হতে পারে। সবশেষে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বেও শূদ্রের পক্ষে উন্নীত হওয়া সম্ভব বলে স্বামীজী মনে করেন। সুতরাং গীতার দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে স্বামীজী শূদ্রমুক্তির বিষয়টিকে ব্যাখা করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

অন্যদিকে, স্বামীজী যখন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে শূদ্র জাগরণের কথা বলেন, তখন আসলে তিনি মনুবাদী ভাবনার গোড়ায় কুঠারাঘাত করতে চান। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চান যে, জাতি হিসাবে শূদ্ররা চিহ্নিত হলেও, ব্রহ্মার পদতল থেকে উৎপন্ন হলেও তাদের মুক্তির বিষয়টি অলীক নয়। বস্তুত, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে শূদ্র জাগরণ ঘটলে সেই শূদ্ররাই বৈদান্তিক সাম্যবাদের সফল প্রতিচ্ছবি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের মুক্তি ঘটবে তথাকথিত বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, বিবেকানন্দ প্রথম ধাপে শূদ্রমুক্তি বলতে বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে শূদ্রজাতির মুক্তির কথা বুঝিয়েছেন। আবার একইসঙ্গে

তিনি শূদ্রব্যক্তির পক্ষে শূদ্রত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ারও সুযোগ দেখিয়ে শূদ্রমুক্তির বিষয়টিকে আধ্যাত্মিকতার ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে এসেছেন। এ বিষয়টিকে আমরা বলতে পারি বিবেকানন্দের ভাবনায় শূদ্রমুক্তির দ্বিতীয় ধাপ।

প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী শূদ্রমুক্তির বিষয়টিকে এতো গুরুত্ব দিয়েছেন কেন ? অন্যদিক থেকে বলা যায়, শূদ্রমুক্তির প্রয়োজন কী ? এর উত্তরে বলা যায় যে, স্বামীজীর ভাবনায় শূদ্রমুক্তি একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। প্রথমত: জাগতিক বর্ণব্যবস্থার শৃঙ্খলের ফলে যে শূদ্রজাতি নিজেদের দাস ছাড়া কিছু ভাবতে পারতো না; যে শূদ্র জাতি মনে করত যে, বংশপরম্পরায় তাদের অত্যাচারিত এবং অবহেলিত হতে হবে; তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। তাদের মধ্যে মানুষ হওয়ার ভাবনা জাগিয়ে তোলা। সুতরাং স্বামীজী চেয়েছিলেন শূদ্র জাতির সামাজিক কল্যাণ। সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে এই সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হোক — এটাই ছিল স্বামীজীর ভাবনা। এই ভাবনা বাস্তবায়িত হলে তবেই স্বামীজীর বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সুতরাং শূদ্রমুক্তির বিষয়টি স্বামীজীর দর্শন চিন্তাকে তথা অদ্বৈতবাদী বেদান্ত ভাবনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা স্বামী বিবেকানন্দকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল বিশ্বমানবতাবোধ। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল উপনিষদের ধারায় পরিপুষ্ট। স্বামীজীর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর হতাশাগ্রস্ত নরনারীকে উপনিষদের ভাবধারায় জাগ্রত করা। বিবেকানন্দ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষের জনগণের বিশেষভাবে হিন্দুদের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হল জাতপাত সম্বন্ধীয় প্রথা। স্বামীজী সমাজে এই বিরক্তিকর কুপ্রথার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মানবসংহিতার সাধক। বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তা ও চেতনায় শোষিত-ব্যথিত দুঃখী মানবজীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন,

> "আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।"[৩]

বিবেকানন্দ ছিলেন একজন ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ভারত একদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ক্ষুধা দরিদ্র থেকে সমাজ মুক্ত হবে। তিনি দেশের দরিদ্র জনগণের উপর ধনী ব্যক্তিদের প্রাধান্য, শোষিত অনুন্নত নিম্নশ্রেণির উপর উচ্চশ্রেণির প্রভুত্ব একেবারেই সমর্থন করেননি। বিবেকানন্দ জাতিব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়ম ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা বললেও জাতিগত অসাম্যকে তিনি কখনই সমর্থন করেননি। তাঁর ভাষায়,

> "জাতি বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্যসাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো। ... এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না, তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে আর আমি একটা আম চুরি করিলে ফাঁসি যাইতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার তারতম্য উঠিয়া যাইবে। ... তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই — কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুযোগ থাকিবে।"[৪]

স্বামীজী ভারতকে বেদান্তের ভিত্তিভূমিতে একটি সার্বভৌম জাতীয় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভারতের খণ্ডিত সত্তাকে তিনি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি ভারতীয়ত্ব বোধ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রাচীন 'পুরোহিত' তন্ত্রের উত্তরাধিকারী সমকালীন সমাজপতিদের অনাচার ও অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি ভারতীয়

জাতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছিলেন নিঃসংশয় কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের ধর্মীয় অভিভাবকত্বে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। সমাজে অন্যায় প্রথাগুলিকে তিনি সমর্থন করেননি। বিবেকানন্দ বলতেন যে, মানুষের মধ্যে যে দেবতা ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে হবে, মানুষকে টেনে তুলতে হবে দেবত্বে। ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, সমাজ-জীবন সবকিছুর একমাত্র লক্ষ্য এই দেবত্বের বিকাশ। তিনি বৈদান্তিক আদর্শকে সামনে রেখে সব মানুষের ঈশ্বরত্বের ধারণা স্বীকার করছেন। স্বামীজী অস্পৃশ্য জাতির অন্ধকার দূর করে চেতনার বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে,

> "আমাদের নিম্নশ্রেণির জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। ... তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে — জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে — তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা — অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য — কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।"[৫]

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছে এমন এক সময় যখন সারা দেশব্যাপী শিক্ষা চরম সংকটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্নহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন কারণ তাদের কোন শিক্ষার সুযোগ নেই। উঁচু জাতির লোকেরা শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, বাকি অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তিনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা নয়, মানুষ তৈরি করা এবং চরিত্র গঠন করা। সমস্যার মূলে পৌঁছে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, চেতনার দরজা খুলে দিতে হবে এটাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি স্বামীজীর প্রত্যাশা —

> "জাতি-জন্ম-নির্বিশেষে, অজ্ঞ, অশক্ত, নরনারী শিশু সকলেই শুনুক ও শিখুক যে, কি শক্তিমান, কি দুর্বল, কি উচ্চ, কি নীচ প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম আত্মা রহিয়াছে। সুতরাং মহান ও মহৎ হইবার অসীম সম্ভাবনা ও অসীম শক্তি সকলেরই আছে। ... উঠ, দাঁড়াও নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রকাশ কর; তোমাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না।"[৬]

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন সমাজে পিছিয়ে পড়া শূদ্র জাতির পেছনে মূল হেতু হল চরম দারিদ্র্যতা। একইসঙ্গে শিক্ষার অভাবকেই তিনি শূদ্র শোষণের মূল কারণ বলেছেন। তাই সবার আগে দরকার শূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। বিবেকানন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শূদ্রদের মুক্তি ছাড়া ভারতীয় সমাজের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ ভারতের দারিদ্র ও অজ্ঞানতার জন্য ইংরেজ শাসনকে আংশিকভাবে দায়ী করলেও তিনি তাঁর স্বদেশী উচ্চবর্ণের, ধনিক শ্রেণির মানুষদের সমানভাবে দায়ী করেছেন। ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষত জমিদার ও পুরোহিতবর্গ সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর যুগ-যুগান্তর ধরে যে অত্যাচার করে এসেছে তা সংশোধিত না হলে এদেশের উন্নতি অসম্ভব। শূদ্রজাত মানেই নৈসর্গিক নিয়মের পরাধীন কারণ তাদের বিদ্যা নেই। স্বামীজী 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত ? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দন্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারততের দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি ?"[৭]

আধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দ সমাজনিয়ন্ত্রক রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা, এমনকি তাঁর সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনেও রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির ওপরে স্থান দিয়েছেন মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ, ধর্ম ও চেতনাকে। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা অঙ্কন করে বলেছেন,

> "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যদর্শ — এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[৮]

বিবেকানন্দ নিজে কোন বিশেষ শাসক শ্রেণির সম্পর্কে পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। কিন্তু তিনি বিশ্লেষণের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামীদিনে শূদ্র শাসন আগত।

সমাজসংস্কার ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন স্বামীজী — তিনি তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে জীবসেবাকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করেন। প্রতিটি জীব ব্রহ্মের অংশ এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম উপস্থিত। সুতরাং সেই জীবকে ভালোবাসা এবং সেবা করাই প্রকারান্তরে ব্রহ্মকে ভালোবাসা, ব্রহ্মকে সেবা করা। বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযোগে বিশ্বাসী একজন মানবপ্রেমিক। একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে ঘুরে, অস্পৃশ্য দরিদ্র থেকে শুরু করে রাজা-মহারাজা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজে পিছিয়ে পড়া শূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা কী দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। দরিদ্র অস্পৃশ্যদের সমর্থন করেই বিবেকানন্দের মন্তব্য —

> "কে অস্পৃশ্য! এরা নারায়ণ! হোক না দরিদ্র, কি আসে যায়, এরা যদি আলো না পায়, এদের যদি জাগানো না হয়, এদের আপন বলে পাশে স্থান না দেয়া হয় তাহলে দেশ কোনদিন জাগবে না।"[৯]

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবোধ, যাকে তিনি পূর্ণত্ব বলেছেন, তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে যে সামাজিক বৈষম্য রয়েছে সেই বৈষম্যকেই যাবতীয় বন্ধনের মূল কারণ বলেছেন। তিনি কখনোই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকে চরম মাপকাঠি বলে মনে করেননি। স্বামীজী ছিলেন ভারতপ্রেমী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যিনি ভারত দর্শন করেছেন তিনি সমগ্র বিশ্ব দর্শন করেছেন। তাই ভারতবাসীকে স্মরণ করে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন,

> "নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল — ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"[১০]

সমাজে পিছিয়ে পড়া চিরপদদলিত মানুষের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে দরদ তার উৎস হল অদ্বৈত বেদান্ত। বেদান্ত মতে, সমাজের সব মানুষ মূলত এক। স্বামীজী মনে করেন প্রত্যেক মানুষেরই মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার আছে। তিনি প্রচলিত জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কৃত্রিম জাতি ব্যবধানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা, অনাড়ম্বর জীবন, নিরভিমানতা, উদারতা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলী মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে, এই সমস্ত গুণাবলীর বিকাশ হোক সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে। সমাজে সব শ্রেণির মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি ছাড়া কোনো দেশের উন্নতি হতে পারে না। বিবেকানন্দ একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিউইয়র্ক থেকে রাজা প্যারীমোহনের কাছে লেখা (১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৪) এক চিঠিতে বলেছেন,

> "কোনো ব্যক্তি বা জাতি অন্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। আমার মনে হয়, অপরের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথার প্রাচীর তুলিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গতির কারণ।"[১১]

স্বামীজী মুর্খ, দরিদ্র, চন্ডাল — আপামর সকলকেই ভাই বলে সম্বোধন করার আহ্বান জানিয়েছেন,তা আত্মিক জ্ঞাতিত্বের সূত্রে। তাঁর এই অক্লান্ত আহ্বান সকলকে জেগে ওঠার জন্য 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। ভারতের দরিদ্র মানবসম্প্রদায়কে এই সত্য জানানো প্রয়োজন যে তারা হীন নয়, দুর্বল নয় এবং অক্ষম নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে দেবোপম সম্ভাবনা। স্বামীজী বলেছেন,

> "দরিদ্র ব্যক্তিগণ, ভারতের অবহেলিত জনগণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানা এবং শোনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রত্যেকটি নারী, পুরুষ এবং শিশুর জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে, সবলতা, দুর্বলতা নির্বিশেষে শোনা এবং শেখার অধিকার আছে যে এই সবল এবং দুর্বলতার পিছনে কী আছে, উচ্চ-নীচের পিছনে কী আছে। তাদের জানতে হবে যে প্রত্যেকের পশ্চাতে আছে অনন্ত আত্মা, যে আত্মা অসীম সম্ভাবনাকে সুনিশ্চয়তা দান করে এবং একইসঙ্গে প্রত্যেকেরই মহান এবং ভালো হওয়ার অসীম দক্ষতা রয়েছে।"[১২]

স্বামী বিবেকানন্দের যে মূল ভাবনা সমতা প্রতিষ্ঠা তা আসলে বৈদান্তিক সাম্যবাদ। এখানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কোনও জায়গা নেই। এইখানেই কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে বিবেকানন্দের তফাৎ। মার্ক্স মনে করেন, সামাজিক পরিবর্তন আসবে, শ্রেণি সংগ্রাম এবং রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের মূল কথাই হবে, উচ্চবর্ণকে নিচে নামিয়ে আনা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কোনও প্রয়োজন নেই। সমাজের মূল পরিবর্তন হবে levelling down নয় levelling up এর মাধ্যমে। বহু শতাব্দী ধরে যে শিক্ষা এবং সংস্কারকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন তাকে আজ বিলিয়ে দিতে হবে সর্বসাধারণের মধ্যে। সর্বসাধারণের মধ্যে সেই শিক্ষা এবং সংস্কার বিলিয়ে দিলে তবেই আসবে শূদ্রদের যথার্থ মুক্তি।

বিবেকানন্দ যে বৈদান্তিক সমাজবাদের আলোকে শূদ্র মুক্তির বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন তার মূল কথাই হল — 'সর্ব ভূতান্তর আত্মা'। এক ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান — এই ভাবনাটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের সমাজবাদ কোনও অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় — তা আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে শূদ্র মুক্তির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন — 'সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্'। বেদান্তের এই বাণী চরম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দ্যোতক ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেদান্তে যে চরম সাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছে তার স্বরূপটি উল্লেখ করা আবশ্যক। মহর্ষি বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা

করেছেন বিভিন্ন আচার্যগণ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য এবং নিম্বার্কাচার্য। এঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদকেই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার বৈদান্তিক ভিত্তিভূমি রূপে গ্রহণ করেছেন। অদ্বৈতবাদের মূল কথাই হল — ব্রহ্মই একমাত্র সত্য তত্ত্ব, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। একই ব্রহ্ম বহুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং জগতের সকল নরনারী নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ একই আত্মার প্রকাশ। মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয়, আত্মার দিক দিয়ে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। কেবল আত্মশক্তি তারতম্যের প্রকাশের কারণেই তারা ভিন্নতাপ্রাপ্ত। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্তবেদ্য চরম সাম্যকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামীজীর মতে,

> "বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্য ও পর্বত গুহায় আবদ্ধ থাকবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রর অধ্যায়নাগারে — সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক বালিকা যে কাজই করুক না কেন সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।"[১৩]

স্বামীজী মানবজীবনের সকল বিভাগ, এমনকি ব্যক্তিমাত্রের প্রাত্যহিক জীবন পর্যন্ত বেদান্তের চরম সাম্যের নির্দেশে পরিচালনা করার পক্ষপাতি ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে বেদান্ত দর্শনের সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মানবের অন্তর্লোকে। এইভাবেই তিনি বেদান্তের সঙ্গে সমাজবাদকে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ সচেতন ছিলেন এই কৃত্রিম জাতিব্যবস্থা একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। তিনি শ্রমজীবী, অবহেলিত, পদদলিত জনসমাজকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়,

> "এই যে চাষাভুষা, মুচি-মুদ্দাফরাস — এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করেছে, মুখে কথাটি নেই। ... এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদন্ড — সবদেশে।"[১৪]

স্বামীজী জানেন শূদ্র অবহেলিত শ্রমজীবীদের মধ্যে আছে অপরিসীম শক্তি এবং এই সম্প্রদায় কায়িক শক্তির অনুশীলনে দৈহিক বলের অধিকারী। এরা কষ্টসহিষ্ণু, তাই এদের প্রাণশক্তি অটল। এরা প্রচলিত ব্যবস্থাকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে হাতের মুঠোয়। স্বামীজীর ভাষায়,

> "এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে — তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে — তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!"[১৫]

পাশ্চাত্য দেশের শূদ্র জাগরণ তথা সর্বহারা শ্রেণির জাগরণ ধনসম্পদ এবং ভোগসম্পদের প্রাচুর্যের নীতিতে পরিচালিত। কিন্তু স্বামীজীর কাছে শূদ্র জাগরণের লক্ষ্য কেবল আর্থিক সমৃদ্ধি নয়, আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের মানবিক গুণগুলিও সমানভাবে বিকশিত হবে এটাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়,

> "হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান,

> আলেকজেন্দ্রিয়া, ... সমরখন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি ? — কে ভাবে এ কথা ... তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! — তোমাদের প্রণাম করি।"[১৬]

ভারতীয় সমাজ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে, বিবেকানন্দ বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতাকে একই স্থানে নিয়ে এসেছেন। ভারত পরিব্রাজন করার সময় বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হন। এরই মধ্য দিয়েই তিনি ভারতীয় সমাজে দরিদ্র, অশিক্ষা, জাতিব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে আরোও ভালোভাবে পরিচিত হন। এর পাশাপাশি তিনি হিন্দু জাতি-ব্যবস্থার অশুভ দিকগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিবেকানন্দ উঁচু জাতির বিশেষাধিকার মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> "যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোগজার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।"[১৭]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন একজন ব্রাহ্মণের সন্তানের যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, শূদ্রের সন্তানের দশজন শিক্ষকের প্রয়োজন। এর কারণ প্রকৃতি যাকে স্বাভাবিকভাবে প্রখর করেনি তাকেই তো বেশী সাহায্য করতে হবে। এ বিষয়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন,

> "If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all - of if greater for some and for some less - the weaker should be given more chance than the stronger অর্থাৎ চন্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চন্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।"[১৮]

হেরিডিটি যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলেও তো ব্রাহ্মণের সন্তান বুদ্ধিমান হয়েই জন্মাবে। কিন্তু নিম্নজাতি অর্থাৎ শূদ্রজাতি যদি বুদ্ধিমান না হয় তাহলে তাদের বেশী শিক্ষা দিতে হবে।

বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত সমাজসংস্কারক। তিনি বিশ্বাস করেন দরিদ্র অবহেলিত মানুষের উন্নয়নে প্রয়োজন আত্মবোধ। তিনি বনের বেদান্তকে প্রাত্যহিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন এবং চেয়েছেন দেশের মানুষকে বেদান্ত দর্শনের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে। স্বামীজী মনে করেন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র অসহায় অবহেলিত নিপীড়িত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরি বেদান্তের সমদর্শনের বাণী,

> "মহান ধারণাটি হল এই যে, আজকের জগৎ আমাদের কাছ থেকে সম্ভবত নীচু জাতির কাছ থেকে উঁচু জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি চায়। নীচু জাতিকেই সংস্কৃতিবান জাতি অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষিত অপেক্ষা অজ্ঞদের, সবল অপেক্ষা দুর্বলদের কথা বেশি ভাবতে হবে — এটাই সমগ্র বিশ্বের

আধ্যাত্মিক ঐক্য লাভের চিরন্তন মহান ধারণা।"[১৯]

স্বামীজী ভারতের শ্রমজীবী শূদ্র মানুষের ভয়াবহ দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান করে তাদের মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন শাসক শ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই শাসক শ্রেণির শাসনের অবসান ঘটেছে। স্বামীজী ছিলেন ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর চিন্তায়,

> "মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয় — পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)।"[২০]

প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষ-গুণ দুই-ই বর্তমান থাকে। পুরোহিত শাসনে একদিকে সঙ্কীর্ণতা অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। ক্ষত্রিয় শাসনে একদিকে অত্যাচার, অন্যদিকে শিল্প ও কৃষ্টির উৎকর্ষ। বৈশ্য শাসনে কৃষ্টির অবনতি, আবার পুঞ্জীভূত ভাবরাশির বিস্তার। শূদ্র শাসনেও অনুরূপভাবে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার, সাধারণ শিক্ষার প্রসার, আবার ঘটবে সংস্কৃতির অবনতি। বিবেকানন্দের মতে, ইতিহাসের গতিসূত্র অনুসরণ করলে শূদ্র শাসন অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর ভাষায়,

> "সর্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে — এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।"[২১]

— অর্থাৎ শূদ্র অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন শুধু তাই নয়, শূদ্র অধ্যুষিত সমাজে তার সংস্কৃতি কি রূপ নেবে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

বিবেকানন্দ হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিম্নতম বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী মানুষকে। তিনি শ্রমজীবীদের কোথাও শূদ্র জাতির বা কোথাও শূদ্র শ্রেণির সমস্যা বলে বর্ণনা করেছেন। শূদ্রশক্তির জাগরণ ও তাদের শাসন প্রতিষ্ঠাকে বিবেকানন্দ অনিবার্য বলেছেন, তিনি এই শাসন ব্যবস্থাকে স্বাগতও জানিয়েছেন। যুগ-বিবর্তনের অনিবার্যতায় স্থির বিশ্বাস ছিল স্বামীজীর। তাঁর চিন্তায়,

> "তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্র ধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্ররা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[২২]

'শূদ্র জাগরণ' — এই কথাটির মাধ্যমেই স্বামী বিবেকানন্দের সমাজবাদী ভাবনার মূল সুরটি ধরা পড়ে। পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপটে যেমন সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত কথাটি প্রযোজ্য হয় শোষিত সম্প্রদায়কে বোঝাবার জন্য, তেমনি ভারতের প্রেক্ষাপটে 'শূদ্র' কথাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু শূদ্র বিপ্লবের ও শূদ্র শাসনের যুগ বলেই ক্ষান্ত হননি। শূদ্র বিপ্লব অপরিহার্য এবং কাম্য বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতে শ্রমশক্তির ক্ষমতায়ন এবং শ্রমজীবীদের অভ্যুত্থান। স্বামীজীর প্রার্থনা, বিলুপ্ত হয়ে যাক উচ্চবর্ণের আধিপত্যের দুঃস্বপ্ন, উদয় হোক নতুন যুগের, নতুন ভারতের আবির্ভাব ঘটুক। এই শূদ্র জাগরণের মধ্য দিয়েই নতুন ভারত গড়ে উঠবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর অমর বাণী,

> "... নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের

> ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।"[২৩]

শূদ্র জাগরণ ঘটবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত জাতির যে উন্নত সংস্কার তার বিনাশ ঘটবে না। শূদ্র জাতিকে তিনি অসাধারণ শক্তির আধার বলে মনে করতেন। একইসঙ্গে তিনি এটাও চেয়েছিলেন যে, শূদ্রদের এই অপরিমিত শক্তি জাগরিত হোক এবং ভারতবর্ষের উন্নতির পথে সহায়তা করুক। শূদ্র শাসনের অনিবার্যতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন,

> "তোমরা আমার থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে, ভারতে অভ্যুত্থান ঘটবে তারপরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।"[২৪]

এই ভবিষ্যৎ বাণীর ভিত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন —

> "তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি আবরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে এই অন্তর্দৃষ্টি আমি অর্জন করেছি।।"[২৫]

এবার আসলে শূদ্রের পালা বা শ্রমজীবীদের পালা। এমন একটা সময় এগিয়ে আসছে, যেখানে শূদ্র বা শ্রমজীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এরই পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্য জগতে। আজকের পৃথিবীতে সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নিহিলিজম্ হল সেই বিপ্লবের জয়ধ্বজা। স্বামীজীর এই ভবিষ্যত বাণী আজ সফল হতে চলেছে। শ্রমজীবীদের মধ্যে এসেছে চেতনা, পরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে আর চায় না তারা। উনি বলে গেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শাসনের পালা সমাপ্ত হয়েছে। এবার আসছে শূদ্রের পালা। শূদ্র শাসন আসবেই আসবে। তাকে রোধ করার সাধ্য কারোর নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রমিক, মুচি, মেথর, মুদ্দোফরাসদের আত্মনিষ্ঠা এবং কর্মতৎপরতা উচ্চবর্ণের চেয়ে অনেক বেশী। এরা চিরকাল নীরবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে, শস্য উৎপন্ন করছে অথচ এরা পড়ে রয়েছে একধারে সবার নীচে। কিন্তু একদিন থাকবে না। শীগ্‌গীর এরা উচ্চবর্ণের উপরে উঠে আসবে।

ভারতবর্ষেই শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে শূদ্ররাই জাতির মেরুদন্ড স্বরূপ। এরা কাজ বন্ধ করে দিলে উচ্চবর্ণেরা অন্ন-বস্ত্র পাবে না। জীবন সংগ্রামে এরা ব্যস্ত থাকার ফলেই এতদিন তাদের জ্ঞানান্বেষণ হয়নি। যন্ত্রের মতো কাজ করে এসেছে এরা এতদিন এইভাবে। বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা তাদের পরিশ্রম এবং উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছেন,

> "জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে নিম্নশ্রেণির লোকেদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে — আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই! ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গন্ডা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইওরোপ, আমেরিকায় ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে — ছোট-লোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা, ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না।"[২৬]

একদিন এই শূদ্রজাতির জাগরণ ঘটবেই ঘটবে। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং দেশ তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবেই ঘটবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় শূদ্রমুক্তি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১৩

২. চক্রবর্তী, জয়ন্ত (আচার্য) (সম্পাদিত): মনুসংহিতা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অনূদিত (মূল সহ), কিছু অংশ সংযোজিত, সঞ্চয়ন প্রকাশনী, ১২১ এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯, ২০১১, পৃ. ১২।

৩. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭০।

৪. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, ২০১৫, পৃপৃ. ১৩৭-৩৮।

৫. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২, পৃ. ৩৪৬।

৬. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'জীবন ও বিশ্ববাণী', পৃ. ১০৭।

৭. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৮৭।

৮. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৩৭।

৯. ইসলাম, আমিনুল: 'বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫৮।

১০. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৯৪।

১১. মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ: 'বিবেকানন্দ রচিত' (একাদশ মুদ্রণ), কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ১৪৫।

১২. 'The Complete Works of Swami Vivekananda', Vol. III, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entarlly Road, Kolkata, 2013, p. 193.

১৩. পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী (সম্পাদনা): 'যুগদিশারী বিবেকানন্দ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৫০।

১৪. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃপৃ. ৩৯২-৯৩।

১৫. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৬৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৮৩।

১৭. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬, পৃপৃ. ৫৯-৬০।

১৮. তদেব, পৃ. ৭২।

১৯. 'The Complete Works of Swami Vivekananda', Vol. III, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entarlly Road, Kolkata, 2013, p. 188.

২০. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৩৭।

২১. তদেব, পৃ. ২৩৭।

২২. বিবেকানন্দ, স্বামী: 'বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৮৮।

২৩. তদেব, পৃপৃ. ৬৪-৬৫।

২৪. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ: 'স্বামী বিবেকানন্দ', প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩০৮; C/F 'আমার ভারত অমর ভারত', স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী প্রকাশন, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৩৯।

২৫. তদেব, পৃ. ৩০৮।

২৬. চক্রবর্তী, শরচ্চন্দ্র: 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ', উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃ. ১১৮।